দারুন ম্যাজিকওয়ালা বন্ধু

শ্যামল ঘোষ

মানুষের জীবনধারা-তো সাধারণভাবে প্রবহমান নদীর মতো সরল, স্বচ্ছন্দই থাকতে চায়। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অব্যাহত রাখতে চায় তার মরা-কটাল ভরা কটালের চলমান ছন্দোবদ্ধতা। আকস্মিক বাধা বিপত্তিই কেবল তাকে বিব্রত, সংক্ষুব্ধ করে তোলে। স্বাচ্ছন্দ ব্যাহত হলে তার অবরুদ্ধ স্রোতধারা মরিয়া শক্তিতে তখন ভিন্নপথ বানিয়ে নেয়। গতিময়তা থামতে দিতে চায় না। কেননা সে যে সমুদ্রের কাছে দায়বদ্ধ। তার সমীপে না পৌঁছানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই।

এসব কথা মনে পড়ল এমন একজন মানুষের কথা ভেবে যাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুতার কাল অর্ধশতক পেরিয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি প্রয়াত মোহিত চট্টোপাধ্যায় — কবি ও নাটককার হিসেবে যাঁর বিরলখ্যাতি সাহিত্য ও নাট্যরসিক সমাজে অবিসংবাদী ছিল। আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি যে নিষ্ঠুর জীবন আমার সেই প্রিয়তম বন্ধুর শোকস্মৃতি লিখতে একদিন আমাকে এমনভাবে বাধ্য করবে।

মোহিতের কবিতার খরস্রোত কোন বাধায় একদা অবরুদ্ধ হয়েছিল আমার তা জানা নেই, কিন্তু তাঁর কবিতার ধারাবতী যে তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়েই ক্রমোৎসারিত হয়েছিল তাতে সম্ভবত কোনো দ্বিধা নেই কারও মনে। তাঁর কবিতার আবেগ এবং তীব্রতা ভিন্ন পথে রূপান্তরিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর নাট্যের মধ্য দিয়ে। নদীর গন্তব্য যে সমুদ্র সেই লক্ষ্যে অবিচল ছিল তাঁর তামাম শিল্পকৃতি, যাবতীয় কারুবাসনা।

এখনো বেশ মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি কোনও একটা সময়ে যখন আমরা দু'জনেই তখন সদ্য যৌবনের চৌকাঠে পা রেখেছি। আর পাঁচ'টা বাঙালি ছেলের মত দু'জনেরই তখন পদ্য লেখার অভ্যেস ছিল। কবি হিসেবে মোহিত

তখনই ঢের খ্যাতিমান। উত্তর কলকাতার কী একটা ছাপাখানায় দু'জনেরই প্রথম কবিতার বইয়ের ছাপার কাজ চলছিল তখন। মোহিতের আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আমার অগ্নিপাটের শাড়ি। বিকেলে দু'জনেই নিয়ম করে প্রুফ দেখতে যাই। সেই নাম ভুলে যাওয়া প্রেসেই প্রথম আলাপ। আলাপ থেকে বন্ধুতা, ক্রমে অন্তরঙ্গতা।

দু'জনের প্রথম কবিতার বই একই সঙ্গে একই ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হলেও প্রতিভাবান কবি হিসেবে তার ঢের আগে থেকেই মোহিত কবিতারসিক সমাজের অনেক নিকটবর্তী একটি প্রিয় নাম। সেকালে কবিতা আমিও মন্দ লিখতাম না বলে আমার বন্ধুমহলের কেউ কেউ দাবি করলেও আমি বিলক্ষণ জানতাম তাঁর সঙ্গে আমরা কবিতার কোনও প্রতিভার তুলনাই হয় না। বয়সে ওঁর থেকে আমি খানিক বড় হলেও প্রতিভা ও প্রাজ্ঞতায় মোহিত ছিলেন আমার অগ্রজ। এত সব বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কিন্তু কোনো সীমান্তরেখা ছিল না।

যতদূর মনে পড়ে মোহিত তখন নিমতলা স্ট্রিটের ধার ঘেঁসে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির কাছাকাছি বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট নামের একটি শীর্ণ গলির মধ্যে থাকত। 'একটু ঢুকেই ডানদিকে মাটির গলি। সেটা সোজা গিয়ে বাঁদিক বেঁকেছে একটা বাড়ির তলা দিয়ে। মনে হত সুড়ঙ্গ দিয়ে যাচ্ছি। একটা খোলা বড় উঠোনে গলিটা শেষ হয়েছে। কাপড় কাচা, বাসনমাজা, স্নানকরা চলত উঠোনে। উঠোন ঘিরে ভাড়াটিয়া।' বাংলাদেশ প্রত্যাগত মা-বাবা'র সঙ্গে ছোট ছোট ভাইবোন নিয়ে সেই বাড়ির তিনতলার একখানা সংক্ষিপ্ত ঘরে বড়সড় সংসার পেতেছিল মোহিত, মোহিতের পরিবার। আমাদের অরেক বন্ধু মতি নন্দী আরও লিখছেন 'প্রাচীন জরাজীর্ণ এমন একটি বাড়ি উত্তর কলকাতাতেও বোধহয় দ্রষ্টব্য হওয়ার মতো। উঠোনের ধার থেকে চেঁচিয়ে ডাকতাম। ওর মা বা ভাই কিংবা মোহিতই শিক লাগানো বারান্দায় বেরিয়ে আসত। হাত তুলে অপেক্ষা করতে বলত'।

মোহিতের সংসারে তখন তেমন উপার্জনক্ষম বিশেষ কেউ ছিল না। সেকালের অপাপবিদ্ধ মূল্যবোধ তাকে বাঙালি সংসারের শ্রীরামচন্দ্র সাজিয়েছিল বলে তার পথচলা বেশ দুর্গম ছিল। আয়কর বিভাগের অস্থায়ী কনিষ্ঠ কেরানির তখন কতই বা বেতন? সঙ্গে আরো গুটি দুই ট্যুইশিন সংবলিত অমসৃণ জীবন তার। তবে তাতে তার আনন্দের কোনও ঘাটতি ছিল না সেই আপাত কষ্টের মধ্যে। আমার বিশ্বাস সেই অফুরন্ত আনন্দের উৎসমূলে ছিলেন মোহিতের মা। তাঁর মতো প্রাণশ্বৈর্যময়ী মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। আমার আরও মনে হয় মোহিতের অফুরন্ত বাকবিভূতি আর আশ্চর্য কবিতাগুলি সৃষ্টির ভরকেন্দ্র ছিলসেই পরমারই উদ্যোগ ও প্রেরণা।

এক হাতে সংসার অন্য হাতে কবিতা নিয়ে অল্পকালের মধ্যেই কিন্তু দক্ষ মাদারি

খেলোয়াড়ের মতো শূন্যে তারের উপর দিয়ে অনায়াস হাঁটা আয়ত্ব করে ফেলেছিল মোহিত। এইভাবে চলতে চলতে সেই অসচ্ছল চাকরির ফাঁকে কখন যেন প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে এম.এ. পাশ করে ফেলেছিল। শেষে এদিক ওদিক দরখাস্ত পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ শিকে ছিঁড়ল। একটা শিক্ষকের চাকরি জুটে গেল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কলেজে। কে জানে, হয়ত সেই চাকরিটুকু পেয়ে সংসারটিকে আরো একটু ভালোভাবে সাজিয়ে তোলার স্বপ্নে বুক ভরে-বাতাস নিয়েছিল সেদিন।

জঙ্গিপুরে চলে যাবার পর যে মোহিতের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আগের মতো হত না বলাই বাহুল্য। লম্বা ছুটিছাটায় কলকাতায় এলে অবশ্য মাঝেমধ্যে দর্শন মিলত তার। এমনকী আড্ডাও হত কালেভদ্রে। কেননা ততদিন আমার মাথায় থিয়েটারের পোকা বাসা বেঁধেছিল। তারই তাড়নায় অনেকে মিলে ততদিনে একটি নাটুকে দল খুলেছিলাম 'গন্ধর্ব' নামে। তাতে অবশ্য বেশিরভাগই ছিল স্কটিশচার্চ কলেজের ফার্স্ট ইয়ার সেকেণ্ড ইয়ারের বালখিল্যের দল। অভিনয়ের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না বটে, তা বলে আবেগের ঘাটতি ছিল না তাদের এতটুকু। সেই অপটু হাঁসের দলে আমিই তখন একমাত্র বকের মতো, যেটুকু জেনে বুঝে এসেছিলাম ভারতীয় গণনাট্য সংঘে কয়েক বছর কাজ করার সুবাদে — সেই বিদ্যেটুকু সম্বল করেই চলত কর্মকাণ্ড।

থিয়েটারের ঘোরের মধ্যে বসবাস করতে করতে সময় পেরিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত লয়ে। ততদিনে মোহিতের সঙ্গে যোগসূত্র অচ্ছিন্ন না হলেও তার চলন বিলম্বিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। ইতিমধ্যে শেক্ষপির সাহেবের চতুর্থ জন্মশতক আসন্ন হওয়ায় গন্ধর্বরই এক প্রাক্তন সদস্য, নীতিশ দত্ত, যিনি তখন পাকাপাকি ভাবে লন্ডনপ্রবাসী, ডাকযোগে একখানা নাটক পাঠালেন এই আশায়, যদি সেন্টিনারি উপলক্ষে তা মঞ্চস্থ করা যায় গন্ধর্ব থেকে।

নাটকটির নাম ছিল উইল শেক্সপিয়র : অ্যান ইনভেশান। মহাকবি শেক্সপিয়রের জীবনাশ্রিত এক কল্পকাহিনি নিয়ে পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাব্যনাট্য। নাটকটি পড়তে পড়তে এমন মুগ্ধ হলাম যে তখনই মনে পড়ল মোহিতের কথা। একমাত্র কবি ছাড়া, বিশেষ করে মোহিত ছাড়া, এমন অসামান্য কাব্যনাট্যের অনুবাদ অসম্ভব।

খুব ব্যাকুলভাবে যদি কাউকে চাওয়া যায় মনে মনে, হয়তো টেলিপ্যাথির অদৃশ্য তরঙ্গ তার অবচেতনে ঠিক দোলা দিয়ে যায়। নইলে কেনই বা হেদুয়ার মোড়ের বসন্ত কেবিনে ঢুকতেই আচমকা সেদিন দেখা পেয়ে যাব মোহিতের? একাধারের টেবিলে দিব্য দু'কাপ চা নিয়ে খোসগল্পে মশগুল মোহিত আর মতি। গল্পকার মতি নন্দী। আমার ঢোকাতেই বোধকরি একটা ত্রিশক্তি যোগ ঘটল।

মতির বেহুলার ভেলা গল্প তখন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন তুলেছে।

কৃত্তিবাসের সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যে তখন মতি নন্দী আর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় গদ্যশিল্পের দুই দিকপাল কারিগর। ততদিনে মোহিতেরও নতুন কবিতার বই গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রকাশিত হয়ে নবীন কবিমহলে ধুন্ধুমার বাধিয়ে দিয়েছে।

অনেকদিন পরে জমপেশ আড্ডা হ'ল সেদিন মধ্যবেলা পর্যন্ত। বাড়ি ফেরার পথে নাটকের বইখানা গুঁজে দিলাম মোহিতের হাতে। বললাম, এর একখানা অনুবাদ চাই কিন্তু তাড়াতাড়ি।

মোহিতের ঠোঁটে সেই অনাবিল হাসি। বলল, কাল তো ফিরে যাচ্ছি জঙ্গিপুরে। আগে পড়ে দেখি পারব কী না? দেখেশুনে তো মনে হচ্ছে বেশ কঠিন কাজ।

বইখানা নিঃশব্দে চালান হয়ে গেল ওর কাঁধের ঝোলা ব্যাগটার মধ্যে। আমিও নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

দিন পনের কুড়ি বাদে কী একটা মুসলিম পরব আর রবিবার টবিবার মিলিয়ে দিন তিনেকের একটানা একটা ছুটি পেতেই জঙ্গিপুর থেকে সোজা এসে হাজির হ'ল মোহিত। জিগ্যেস করলাম, কেমন লাগল নাটক? করা যাবে?

কোনো উত্তর না দিয়ে ঝোলার ভিতর থেকে ম্যাজিশিয়ানের মত হাত ঘুরিয়ে বের করে নিয়ে এল একখানা ঢাউস খাতা। উল্টেপাল্টে দেখলাম পুরো নাটকখানাই লেখা হয়ে গেছে। সাবাস মোহিত!

দেরি না করে মোহিতের মুখেই পুরো নাটকটা শুনলাম সেদিন। হায় হায়, কী শুনলাম শুনতে শুনতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম সেই যুগে যেখানে অখ্যাত এক গ্রাম্য যুবক নাটককার হয়ে ওঠার সাধনায় জীবন বাজি রেখেছে। মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছিলাম কয়েক শতাব্দী আগের রানি এলিজাবেথের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাঘরে — যেখানে শেক্সপিয়রের নাটক রোমিও জুলিয়েট প্রথম মঞ্চস্থ হচ্ছে। অভিনয় চলতে চলতে জুলিয়েটের মূল অভিনেতা আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ডার্ক লেডি মেরির সেই ভূমিকায় কী অসামান্য অভিনয়! সংলাপ শুনতে শুনতে ঘোর লেগে যাচ্ছিল। ভাষান্তরের সামান্যতম গন্ধও লেগে নেই সেই নাটকের গায়ে। কোনো কথাটি বাদ না দিয়ে কী স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। আর কী ভাষা! পুরোপুরি গদ্যে লেখা নাটক, অথচ কবিতা যেন তার গায়ে লাজুক লতার মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। ঠিকই বুঝেছিলাম সেদিন —মোহিতের মতো সংবেদনশীল কবি ছাড়া এই কাব্যনাট্য এমনভাবে প্রাণ পেতনা কোনওদিন।

কিন্তু সেই অনুপম নাটকটি আমি শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ করতে পারিনি, অথচ আমারই অনুরোধে কাজটি মোহিত করে দিয়েছিল। কিন্তু কেন পারিনি, না করতে পারার পিছনে কাদের চক্রান্ত সক্রিয় ছিল, কোন আত্মকেন্দ্রিকতা, কোন কুটিল স্বার্থ ফুলের বুকেও রক্তপাত

ঘটাতে চেয়েছিল সেই পুরোনো কাসুন্দি নিয়ে এই পড়ন্ত বেলায় আর তিক্ততা বাড়াতে চাই না। শুধু জানি আমার সেই অক্ষমতার যন্ত্রণা আমরণ আমাকেই বয়ে বেড়াতে হবে — সেটাই আমার নিয়তি। তবে সান্ত্বনা এই আমার সেই অপারঙ্গমতার কারণ বন্ধু মোহিত সেদিন বুঝতে পেরেছিল, আমার অসহায়তা অনুভব করেছিল বলেই হয়তো তা নিয়ে কোনো দিন সামান্যতম অনুযোগও করেনি। পরন্তু নিজেকে আরো প্রস্তুত হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে গেছে।

তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। মোহিত ফিরে গেছে তার জঙ্গিপুরের চেনা আস্তানায়। আমরাও নানান থিয়েটারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সবকিছু যেন চুকে বুকে গেছে। মোহিতেরও ভাবখানা যেন লেখার কথা ছিল, লেখা হয়ে গেছে। তার দায়ও মিটে গেছে। অভিনয় হ'ল কী হ'ল না তা নিয়ে কোনো বাধ্যতা নেই। কোনো চাহিদাও নেই। কেননা নাটক তার বিষয় নয়।

গন্ধর্ব থেকে চমৎকার একটা নাট্যপত্র বেরোতে তিন'মাস অন্তর। রসিক মহলে খুব চাহিদা ছিল পত্রিকাটির। এছাড়া প্রতি বছরেই শারদীয়া গন্ধর্ব নামে একটি বিশেষ সংখ্যা বেরোতো। সম্পাদক ছিল নৃপেন্দ্র সাহা।

সেবার নৃপেনের এম এ পরীক্ষা। পড়াশুনোর জন্যে ছুটি নিল দল থেকে। ফলে পত্রিকা সম্পাদনার পুরো দায় আমার উপর বর্তালো। বাধ্য হয়েই দপ্তর খুলে বসলাম।

প্রত্যেক শারদীয়াতেই এর আগে পাঁচ'টা পূর্ণদৈর্ঘ নাটক ছাপা হত। এছাড়া গোটা দুয়েক ছোট নাটক আর বেশ কিছু প্রবন্ধ থাকত। কী কী নাটক জমা আছে দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম একটি মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক — কণ্ঠনালীতে সূর্য — রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়। ছাপার জন্যে মোহিত নাটক পাঠিয়েছে, অথচ আমি কিছুই জানতাম না?

বিপুল কৌতুহল। মোহিত নাটক লিখেছে? সংগোপনে? আমাকে না জানিয়ে? আবার আমাদের কাগজেই চুপিচুপি পাঠিয়েছে ছাপার জন্য? অবাক কাণ্ড!

মোহিতের ক্ষমতা আমি জানি। উইল শেক্সপিয়ারের অনুবাদেই তার কলমের জোর আমি টের পেয়েছি। গদ্যে সে ফুল ফোটাতে জানে। কিন্তু এতো গল্প-প্রবন্ধ নয়। নাটক। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফর্ম। কে জানে? ভাবতে বেশ মজা লাগল।

বাড়িতে নিয়ে এলাম নাটকটা। রাতে খাওয়া দাওয়ার শেষে আলো জ্বেলে পড়তে বসলাম। ঘন্টাখানেকও লাগল না। পড়া শেষ। তারপরেও খানিক বসে রইলাম চুপচাপ। তাজ্জব!

এ কী নাটক লিখেছে মোহিত? এ কি নাটক নাকি অন্য কিছু? আবার নাটক যে হয়নি এমন কথা বলার বুকের পাটাও নেই। আবার এতদিন ধরে যে সব নাটক দেখেছি,

পড়েছি, নাটক নিয়ে যেটুকু জ্ঞানগম্যি হয়েছে, সে সব চেনা ছকের মধ্যে এ নাটক পড়ে না। তবু নাটক নয় এমন কথাও তো বলা যাচ্ছে না। এতে নাটকের ফর্ম ও নাট্যগুণ সমুপস্থিত। বুদ্ধিদীপ্ত অনবদ্য সংলাপ। চমৎকার সিচুয়েশন নির্মাণ। দূরন্ত টান। একে বাতিল করব কোন যুক্তিতে?

দো'টানায় পড়ে গেলাম। এতকাল নাটক পড়ে তার ভালো মন্দ খানিক বুঝেছি। এমন স্তম্ভিত হইনি কখনো, —— এমন নির্বোধ। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে আবার পড়লাম। কিন্তু তথৈবচ। সব বুঝলাম। কিন্তু বিষয়বস্তু? উপস্থাপন? আমার এতকালের চেনা বাস্তব জ্ঞানে তা সম্পূর্ণ অচেনা। আবার সেই অচেনা জগৎটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারলে আর কোনো দ্বিধা থাকে না। এ এক আশ্চর্য ডায়লেমা। শেষ পর্যন্ত পাঠকদের বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেওয়া গেল। ছাপা হ'ল নাটকটা।

সেবারে যে ক'টি নাটক গন্ধর্ব শারদীয়াতে মুদ্রিত হয়েছিল তার সবগুলিই ঢের সুনাম বাড়িয়েছিল। কিন্তু সক্কলকে ছাপিয়ে গেল মোহিতের কণ্ঠনালীতে সূর্য। পাঠ্য নাটক হিসেবে বিপুল মান্যতা পেল। কিন্তু তখনো টের পাওয়া যায়নি ভবিষ্যতের সেরা নাটককার হবার পথে কবি মোহিতের বুকের ভিতরে নাটক এসে কতখানি জায়গা নিয়েছে।

মোহিতের কণ্ঠনালিতে সূর্য নাটক গন্ধর্ব পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। আর গন্ধর্ব ছেড়ে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম ১৯৬৩ তে। ইতিমাধ্যে নাটকের দামালপনায় নাজেহাল হয়ে আমার কবিতা মৃতবৎসা। মাঝে মধ্যে গান লিখি সুরকার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। মাঝে মাঝে তা এইচ এম ভি কলম্বিয়া ইত্যাদিতে রেকর্ডও হয়। অনুরোধের আসরে বাজে। আকাশবাণীতে শিল্পীদের গলায় আমার লেখা গান শোনা যায়। বেশ একটা নির্বিকল্প সময়। নতুন থিয়েটারের কোনও হদিশ নেই।

১৯৬৪ সালে আমার এক অভিনেত্রী বন্ধু মমতা চট্টোপাধ্যায়ের পাল্লায় পড়ে আবার নতুন দল হল 'নক্ষত্র'। কিন্তু নাটক কই? প্রথম প্রযোজনাটা খুবই এলেবেলে হল। ফলে আরো হতাশা। অতঃকিম্?

সেকালে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে একটা কফি হাউস ছিল। সকাল সন্ধে সেখানে অজস্র পায়রার বকবকম্। বিশেষ করে ছুটির দিন সকালে তো কথাই নেই। যত রাজ্যের উঠতিকবি গল্পকার নাটুয়া পটুয়া গাইয়ে বাজিয়ের ভিড়। সেখানেই একদিন আচমকা জঙ্গিপুরের প্যাসেঞ্জার মোহিতের সঙ্গে দেখা।

কিছু ঘরোয়া কথাবার্তার শেষে জানতে চাইলাম নাটক লেখার বাতিক কি আছে এখনো —— নাকি পদ্য এত দিনে তাকে কুলোর বাতাস দিয়েছে। কেন, এবারের শারদীয়া গন্ধর্বেও তো নীল রঙের ঘোড়া ছাপা হয়েছে? মোহিতের এই অকুণ্ঠিত উত্তর একটুকাল

থমকে দিল আমাকে। সত্যিই তো সে নাটক আমিও পড়েছি। মোহিত যেন নাটকে ভিন্ন ঘরানা তৈরি করেছে।

তারপর?

তারপরও আছে। কিন্তু করে কে? একবার আমার চরিত্রগুলো মঞ্চে আমার লেখা কথাগুলো বলছে দেখতে পেলে বেশ হত, তাই না?

অবশ্যই কথা বলবে। আমিই বলাব। কিন্তু নাটক কই?

ম্যাজিশিয়ান মোহিত আবার তার ঝোলার ভিতরে হাত ঘুরিয়ে বের করে আনল একখানা লম্বা বাহাদুর খাতা। নতুন নাটক : **'মৃত্যু সংবাদ'**।

মোহিতের সেই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫, রঙমহল মঞ্চে। ঐতিহাসিকভাবে নক্ষত্র প্রযোজিত মৃত্যু সংবাদই মোহিতের প্রথম মঞ্চাভিনীত নাটক।

মোহিতের নাটকের স্বতন্ত্র ঘরানা। কী নাম দেব তার বুঝতে না পেরে নিজেদের কাছেই প্রশ্ন রাখলাম ---- কিম্ ইতি? আশ্চর্য, সেই কিমিতি শব্দটিই কেমন করে যেন কিমিতিবাদে রূপান্তরিত হয়ে অ্যাবসার্ড নাটকের পরিভাষা হয়ে দাঁড়াল! যদিও চরিত্রগতভাবে অ্যাবসার্ড নাটকের সঙ্গে মোহিতের সে নাট্যরীতির কোনো মিল ছিল না।

কবি মোহিতের প্রথম নাটক দেখতে সেদিন কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর কবিকুলই বারো আনা আসন দখল করে নিয়েছিল। এমনকি সুদূর জলপাইগুড়ি থেকে বৌ বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত এসে হাজির। এমনই ছিল আবেগ।

অভিনয়ের আগের দিন প্রতিবেশী বন্ধু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ে 'ট্রাশ' মন্তব্য করে চলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন এ সব নাটক করা সময়ের অপচয়। কিন্তু অভিনয়ের শেষে সেই দীর্ঘকায় মানুষটি ঘরে ঢুকে তেমনি দাপটের সঙ্গেই নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন বলেছিলেন -- "আমি আমার মন্তব্য উইথড্র করছি। আজ নিজের চোঁখে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না নাটকটার মধ্যে এত কিছু ছিল। আই অ্যাম র‍্যাদার স্টুপিফায়েড।" সবার সামনে এমন হেঁকে ডেকে নিজের ভুল স্বীকার করে নেবার হিম্মত সকলের থাকে না অবশ্য। অজিতেশের ছিল।

এরপর থেকে মোহিতের নাটুকে জীবন আর অজানা নেই কারো। সে সব এখন বহুচর্চিত ইতিহাস। তবে প্রসঙ্গত বলা যায় যে সময়ে আমি, ছোট বড় মিলিয়ে, মোহিতের প্রথম পর্যায়ের খান চারেক নাটক ---- **মৃত্যু সংবাদ, চন্দ্রালোকে অগ্নিকাণ্ড, ক্যাপ্টেন হুররা, সোনার চাবি** নক্ষত্র থেকে প্রযোজনা করেছিলাম। এছাড়া অবশ্য অন্য অন্য নাটককারেরও আরো গুটিকতক নাটক ছিল।

অতঃপর অনেকগুলো বছর আমি নিজেই থিয়েটারে গরহাজির ছিলাম। জীবিকার টানে ভেসে

যেতে হয়েছিল যাত্রাদলে। ততদিন মোহিত কিন্তু তার স্বক্ষেত্রে অবিচল। ততদিনে সে একের পর এক অসামান্য নাটক লিখে রসিক দর্শকমণ্ডলীর কাছ থেকে 'আধুনিক কালের সেরা নাটককার'-এর তকমা আদায় করে নিয়েছে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে চলতে সে তার নাট্যভাষা বদলেছে, দর্শন বদলেছে। কবিতার মিশেল তার নাটকে তখন বেনারসি শাড়ির মত বুনোট আর কারুকার্যে ধ্রুপদী মাত্রা পেয়েছে। তখনই আমি যাত্রা থেকে ফিরে তার মধ্যপর্বের নাটক সোক্রাতেস করলাম। সে এক মহান বিদেশি দার্শনিকের জীবনাশ্রুতি নাটক। সে নাটকে মোহিত ঐতিহাসিক নাট্যরচনার প্রচলরীতি কাচের বাসনের মত গুঁড়িয়ে দিয়েছিল।

আলাদাভাবে কবিতা লেখা অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছিল মোহিত। এখন তার নাটকই তার কবিতা। আপাত নজরে কবিতা ছেড়ে পাকাপাকি নাটকে চলে আসায় কবিকুল নিঃসন্দেহে তার উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। কেউ তাকে 'দ্বিচারী' বলতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু কবিতা ছেড়ে কেন তাঁর নাটকে আসা তা কি জানতে চেয়েছেন কেউ?

কিছুকাল পরে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে শোনা গেল কবির কণ্ঠস্বর, দ্ব্যর্থহীন কৈফিয়ৎ। '... যখন কবিতা ছেড়ে নাটকে এলাম তখন মনে হচ্ছিল যে আমার কবিতাকে যেন আমি ছাড়িয়ে যেতে পারছি না। অর্থাৎ আমার কবিতা যেন কোথাও বাড়ছে না। এইরকম একটা অবস্থা যখন আসে তখনো অনেকে কবিতা লেখেন। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, না আমি তা করব না। আমি যতক্ষণ পারব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিতরের যন্ত্রণা চলছে ততক্ষণই চলবে। এটা যদি বন্ধ হয়ে যায় আমি জোর করে দম দিয়ে তাকে চালাব না। ... ঠিক তখনি আমি নাটক লেখার মধ্যে এসেছিলাম।'

নিজস্ব নাট্যরচনা প্রসঙ্গে মোহিতের উচ্চারণ স্পষ্ট। '... কী ধরনের নাটক লিখলে ভাল লাগবে, কী ধরণের নাটক লেখা উচিত, নাটকের বৈচিত্র্য কোথায় আছে ---- এই ধরণের একটা আশ্চর্য রূপরেখা আমার মনের মধ্যে জন্ম নিচ্ছিল। তখন আমি আমার মত নাটক লিখতে শুরু করলাম। ... প্রথমে গন্ধর্ব পত্রিকায় লিখেছিলাম 'কণ্ঠনালিতে সূর্য, পরে নীলরঙের ঘোড়া। কিন্তু যখন মৃত্যু সংবাদ নাটকটা লিখলাম, সেটা শ্যামল ঘোষ 'নক্ষত্র' থেকে প্রযোজনা করেছিলেন। মৃত্যুসংবাদ-ই কিন্তু আমাকে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল এবং নাট্যজগতের মানুষজনের কাছে আমাকে পরিচিত করল। ... এখনো বহু মানুষের কাছেই অন্য ভঙ্গির নাটক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে এ সংবাদটা বহন করে।'

কোনো কোনো সমালোচক বন্ধু অনুযোগ করে থাকেন, মোহিতের নাটকে বড় বেশি কবিতার প্রভাব, কিংবা কবিতা এবং নাটক যে দু'টি স্বতন্ত্র শিল্পরীতি এ কথা মোহিতের বোঝা উচিত ইত্যাদি। এককালে কিমিতিবাদী নাটককার বলেও তাঁকে দাগিয়ে দিয়ে চলতি থিয়েটারের থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সময়ের স্রোতে সে সব কথা বুদ্‌বুদের

মত ভেসে গেছে। তথাপি তাঁর নাটকে কবিতার চরিত্র প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছিলেন সেদিন আকাশবাণীর আলোচনাচক্রে। তা থেকে কিছু তুলে ধরছি।

'অনেকে আমাকে বলেন আমার নাটকের মধ্যে যেন একটা কবিতার চরিত্র পাওয়া যায়। তা, এখন আমি মনে করি এটা তো বেঠিক কেউই বলেন না, কারণ আমি কবিতা লিখতাম। কবিতার মন থেকে আমি নাটক লিখেছি এবং আমি নিজে মনে করি যে আমার নাটকের মধ্যে আমার কবিসত্তাটা কাজ করে। কবিতা আমাকে নাটক লেখায় তাই নাটকের মধ্যে কবিতার রেশ থাকবেই, তার ধর্ম থাকবেই, কবিতার চরিত্র থাকবেই। এবং আমার মনে হয়, আমিও বারবার মনে করি যে নাটককে কবিতা সঞ্জীবিত করতে পারে। তার সংলাপকে তো বটেই, সংলাপের মধ্যে কবিতা এমন একটা আলো ফেলে যার ফলে সে একটা নতুন রূপ নেয়, নতুন একটা তরঙ্গ সৃষ্টি করে যা আমরা লক্ষ করতে পারি পৃথিবীর বিদগ্ধ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের মধ্যে। গ্রিক নাট্যকারদের নাটকে দেখতে পাই কারণ সেগুলোও কবিতায় লেখা হয়েছিল। আমরা শেক্সপীয়রের নাটকের মধ্যে দেখতে পাই, সেগুলোও কবিতায় লেখা হয়েছিল। আমরা সংস্কৃত নাটকগুলোয় দেখতে পাই তাও কবিতায় লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও দেখি সংলাপের মধ্যে কাব্যের দ্যুতি বিকিরণ হচ্ছে। এই যশস্বী নাট্যকারদের অমর যে সমস্ত লেখা, তা প্রমাণ করে দেয় যে নাটকের বিষয়ের মধ্যে কাব্য কতখানি শক্তি নিয়ে, কতখানি অলো নিয়ে আসতে পারে।'

এককালে আমারও কিঞ্চিৎ পদ্য লেখার বাতিক ছিল সে কথা আগেই কবুল করেছি। হয়তো সেজন্যেই, কিংবা সঠিক জানি না কেন, কবিতার তবক মোড়ানো মোহিতের সংলাপ উচ্চারণে বড় সুখ পেতাম। যেমন রীবন্দ্রনাথ কিংবা বুদ্ধদেব বসু'র নাটকে। বিষয়বস্তু ও নাট্যগঠনের নবত্বেও প্রথম থেকেই মোহিত এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় আমি মাঝে মাঝে অন্যদের নাটক করলেও মোহিতের নাটকের মধ্যেই যেন আমার ভিন্ন সুখ, অনাবিল তৃপ্তির অনেকখানিই লুকিয়ে থাকত। তবে আমার সেই ধারাবাহিক থিয়েটারের জীবন নানাবিধ কারণে সংক্ষেপিত হওয়ায় মোহিতের লেখা নাটকগুলির দর্শক হয়েই শেষ পর্যন্ত মধু খুঁজতে হয়েছে। এবং সানন্দে তাই করেছি, এমনকী তাঁর সর্বশেষ নাটক পর্যন্ত।

একসময়ে তীব্র শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হয়ে আমার চলাচল ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। ফলে মোহিতের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও কম। কখনো নাট্য অ্যাকাদেমির সভায় কিংবা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে, কদাচিৎ হলেও, শেষপর্যন্ত ও নিজেই যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন সেটুকুও বন্ধ! অবশেষে দুই পাড়ে দুই বৃদ্ধ মাঝখানে একটি অদৃশ্য টেলিফোনের তার মাঝে মাঝে কিছু সংযোগ রাখত বটে, শেষে ও নিজে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় সেটুকুও ছিঁড়ে গেল।

লোকমুখে ওর অসুখের খবর পাই। নানাবিধ খবর। সেসব বড় যন্ত্রণাদায়ক

খবর। ভিতরে ভিতরে ছটফট করি। কিন্তু একা চলাফেরার শক্তি নেই বলে ঘরের ভিতর গুমরে মরি। ওর স্ত্রী শুক্লার কাছ থেকে বন্ধুর খবর নেবার চেষ্টা করি কখনো কখনো। ওকে সাহস দেবার চেষ্টা করি। একদিন শুনলাম নাকি আপাতত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে, তবে কণ্ঠনালি ছিন্ন। কথা এখন সাময়িক বন্ধ!

বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যবন্ধে যে একদা ছিল সম্রাটের মত অভিজাত, যাঁর তাৎক্ষণিক রঙ্গকথা শোনার জন্যে একসময়ে বন্ধু মহলে, কী কফি হাইসে গুণগ্রাহীর ভিড় উপচে পড়ত অনুগত প্রজার মতো, সেই মানুষ আজ বাধ্যতামূলক ভাবে নীরব? এর চেয়ে মর্মান্তিক ট্রাজেডি আর কী হতে পারে?

ছুটে যেতে চাই। কিন্তু দীর্ঘপথ একা পাড়ি দেবার সামর্থ নেই। সঙ্গী জোটাতে পারি না। অনেকেই আশ্বাস দেন। কিন্তু সময়কালে তাঁদের সময় হয় না। শেষে এক সাংবাদিক বন্ধু অলক চট্টোপাধ্যায় গাড়ি করে নিয়ে গেলেন আমাদের। আমাকে আর আমার স্ত্রী রমা'কে। যখন পৌঁছলাম তখন অসুস্থতার অনেক দিন পেরিয়ে গেছে।

অবশেষে দেখলাম প্রিয় বন্ধুকে। দেখতে দেখতে মন হচ্ছিল বুঝি না দেখাই ছিল ভালো। মনে মনে অনেক কিছু ভেবে নেওয়া যেত। দেখলাম সেই প্রাণোচ্ছল আনন্দময় সুরসিক মানুষটি যেন ক্ষয়ে গেছে। ভিতরের অফুরন্ত আবেগ যেন আগের মতই বাঁধ ভাঙতে চায়। কিন্তু শরীর অনুমতি দিচ্ছে না। মুখের কাছে কান নিয়ে গেলে হয়তো দু'একটি ভাঙা শব্দ অস্ফুট শোনা যায়। তার কিছু বোঝা যায়, কতক অস্পষ্ট। ওঁর প্রথম নাটকের নায়কের কণ্ঠনালীতে সূর্য আটকে গিয়েছিল। কিছুতেই মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। এ যেন তারই জীবন্ত প্রতিরূপ দেখলাম। মোহিতের বুকের ভিতরের দামাল সূর্যটা এখনো বারবার বেরিয়ে আসতে চায়, উদ্ভাসিত করতে চায় তার শিল্পের জগতকে — কিন্তু হায়, মুক্তির পথ নেই। সমস্ত শরীরের সেই অবরুদ্ধ যন্ত্রণার ব্যর্থতা চোখে দেখা যায় না।

কান্না চেপে রেখেছি বুকের মধ্যে। সারা মুখে ঝুলিয়ে রেখেছি বানিয়ে তোলা আনন্দের অভিব্যক্তি — পাছে শুক্লা, সায়ন আর ওর সদ্য পরিণীতা তরুণীটি অসহায়তায় ভেঙে পড়েন। আমাদের দেখে সেদিন বড় খুশি হয়েছিল মোহিত। যেন সেই পুরোনো দিন আবার ফিরে পেয়েছে। বার বার ছুটে আসছিল সেই খুশি প্রকাশ করতে। কিন্তু পরক্ষণেই ওঁর অবসন্ন শরীর ভেঙে পড়ছিল। কষ্ট হচ্ছিল, বড় কষ্ট হচ্ছিল সে দৃশ্য দেখতে। অসহনীয়, অবর্ণনীয়।

খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন ফিরেছিলাম। বুকের ভিতরে বিপুল দুশ্চিন্তা। শুক্লা-সায়নদের মুখের দিকে তাকাতে পারি না। বিভ্রান্ত বিষণ্ণ অসহায়। এত দুর্বিপাকের মধ্যে অন্য অন্য বারের মতো সেদিনেও না খেয়ে ওর বাড়ি থেকে ফিরতে পারিনি আমরা। কিছুতেই

না খেয়ে ফেরা চলবে না — এই কথাকটি বলার জন্যে বারবার রুগ্ন শরীর নিয়ে রোগশয্যা ছেড়ে উঠে আসছিল মোহিত। তার সেই আন্তরিক ব্যাকুলতা, তার বেদনার্ত চোখ দু'টি দেখে অন্তত একটু কালের জন্যে হলেও বন্ধুকে সুখ দিতে চেয়ে তার কথা অমান্য করতে পারিনি।

পরদিন খবর পেলাম সেই রাতেই নাকি তাকে আবার স্থানান্তরিত করতে হয়েছে নার্সিংহোমে। হঠাৎ শারীরিক অবনতির খবর পেয়ে তার সর্বশেষ প্রযোজিত নাটকের নির্দেশক, তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বন্ধু ডা. তপনজ্যোতি ছুটে এসেছেন। চিকিৎসক হিসেবে যথাবিহিত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ক'দিন পর থেকে খবর পাচ্ছিলাম একটু একটু করে ক্রমোন্নতি হচ্ছে। আশায় বুক বাঁধছিলাম। কিন্তু আচমকা বজ্রপাতের মতো শেষ খবরটা এল। মনে পড়ছিল একদা কবিতার জগত ছেড়ে চলে আসা মোহিতের ক'টি পংক্তি :

'বন্ধু নিয়ে ঘর করেছি, অন্য কোনো ঘর ছিল না —
একটা বটের পাতায় চেপে দশজনেতে ভেসে গেছি।
হাল ছিল না, হাত বাড়ালে হাতের মুঠোয় হাত পেয়েছি ...'

— ১২ এপ্রিল ২০১২ ৪টে ২০ তে সেই বন্ধুত্বের মুঠি আলগা হয়ে গেল। বটের পাতা ছেড়ে 'পরম অচিনের মধ্যে' ভেসে গেল মোহিত। বারবার মনে পড়ে তার মৃত্যুসংবাদ নাটকের নায়কের সেই আকুতি মাখা মোহিতীয় প্রশ্ন :

'আমার মন যেখানে ছিটিয়ে দেবেন, ফুলের বীজের মত
বাগান গড়ে দেবে। চোখে যা ছোঁব, ঝাঁক ঝাঁক পাখি হয়ে
উড়ে যাবে। আঙুলগুলো যাতে লাগবে ভোরের রোদ
আর জ্যোৎস্নায় চিক চিক করে উঠবে। — আমাকে একটা সুন্দর
ম্যাজিকওয়ালা মনে হবে। দারুণ লাগবে। — আমাকে আপনি
ভালোবাসবেন?'

কে না ভালোবাসবে তোমাকে মোহিত? আমাদের সকলের জীবনেই দারুণ ম্যাজিকওয়ালা তুমি — আর ম্যাজিক দেখাবে না বন্ধু?